Vol. 53 | No. 3 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ছিন্নপত্র ও রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ-দর্শন

Volume	53
Issue	3
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Rafat Alam
Published online	June 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i3.9
Pages	১৫১-১৬৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ছিন্নপত্র ও রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ-দর্শন

মো. রাফাত আলম মিশু*

সার-সংক্ষেপ : *ছিন্নপত্র* (১৩১৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পত্রসংকলন। এর মূল্য পত্রসাহিত্যের মধ্যে সীমায়িত নয়, বরং পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষতা ও অনুভবের নিবিড়তা জানবার জন্য *ছিন্নপত্র* গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে যেমন জানলেন বিশ্বপ্রকৃতিকে, তেমনি বিশ্বমানবিকতাকেও অনুভব করলেন এই জনাঞ্চল থেকে। বাংলাদেশে আগমন ও অবস্থান রবীন্দ্রজীবনের বড় ঘটনা। বাংলাদেশের মাটি মানুষ ও প্রকৃতি থেকে তিনি পেয়েছেন জীবন ও সাহিত্য-উপাদানের অপার সম্ভার। বাংলাদেশকে তিনি কীভাবে দেখছেন কিংবা বাংলাদেশ তাঁর জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তারই ধারাবাহিক রূপায়ণ দেখতে পাই *ছিন্নপত্রের* পত্রগুলোতে। গদ্যে লিখিত হলেও *ছিন্নপত্রের* পুরোটা জুড়ে রয়েছে কাব্যের লালিত্য, আধার ও আধেয় – দুই দিক থেকেই। এই গ্রন্থ থেকে আবিষ্কার করা যায় রবীন্দ্রজীবনের বড় ধরনের পর্বান্তরকেও। বাংলাদেশকে দেখা এবং সেই দেখা থেকে জীবন-জগৎ ও সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গভীরতর উপলব্ধি ও বোধের আত্মদর্শন তাঁর *ছিন্নপত্র*।

সৃষ্টিশীলতার প্রাচুর্যে, মানসগঠনের সমৃদ্ধিতে ও দৃষ্টিভঙ্গির ঔদার্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) জীবনের চতুর্থ দশকটি (১৮৯১-১৯০০) অনন্য। এই অনন্যতার প্রধান বিশিষ্টতা হচ্ছে তাঁর পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থান এবং সেই সূত্রে বাংলাদেশের অভিজ্ঞান-পরিস্রুত সাহিত্যসৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশে আসতে হয়েছিল পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) নির্দেশে জমিদারি দেখাশোনা-সূত্রে। আর এই সুবাদেই তিনি পেয়ে গেলেন কাদা-মাটি-জলের এক নতুন জগৎ। বাংলার নদী, বাংলার মাটি এবং বাংলার মানুষ তাঁর উদারনৈতিক বিশ্বমানবিক দর্শনের প্রধানতম উপাদান। এর সত্যতা মিলবে এই দশকে রচিত তাঁর কবিতায়, গানে, ছোটগল্পে ও চিঠিপত্রে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৮৭৩-১৯৬০) লেখা চিঠির সংকলন *ছিন্নপত্র* (১৩১৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলাদেশ-দর্শনের স্মারকসৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এখানে দর্শন বলতে দেখা ও দার্শনিকতা – দ্বিবিধ তাৎপর্যকেই নির্দেশ করা হচ্ছে। এই দর্শন বহুপ্রান্তস্পর্শীও বটে। মূলত *ছিন্নপত্র*কে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ-ভাবনা, বাংলাদেশের মানুষ, প্রকৃতি, নদ-নদী, জনজীবন, জীবন-যাপনের বিচিত্রতা, সাহিত্যচিন্তানিরীক্ষণ বর্তমান আলোচনার অন্বিষ্ট।

এক.

ছিন্নপত্র প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। ২৪শে জুন ১৮৮৬ থেকে ৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৫ পর্যন্ত লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৫৩টি চিঠির সংকলনগ্রন্থ হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়। *ছিন্নপত্রে*র প্রথম আটটি চিঠি বন্ধুপ্রতিম লন্ডনপ্রবাসী শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উদ্দেশে লেখা। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত রচিত চিঠিগুলো ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে। আর পূর্ববঙ্গ থেকে লেখা ইন্দিরা দেবীকে প্রথম চিঠি ১৮৮৯ সালের নভেম্বরে, যদিও তখনও তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেননি। এর মধ্যে তিনি লন্ডন ভ্রমণ করেছেন (১৮৯০)। ১৮৯১-এর জানুয়ারি থেকে তাঁর যেসব চিঠি পাওয়া যায়, তাতে বাংলাদেশে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট। *ছিন্নপত্রে*র 'গ্রন্থপরিচয়ে' উল্লেখ আছে – 'এই সময়ে লিখিত যাবতীয় চিঠি ইন্দিরাদেবী দুটি খাতায় স্বহস্তে নকল করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়াছিলেন। এই খাতাদুটি অবলম্বনে ১৩১৯ সালে 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয়।' (রবীন্দ্রনাথ ১৪২২ : ২৯৩) 'ইন্দিরা দেবী খুব সম্ভব ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ওই নকল করা খাতা দুটি রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন।' (গোপালচন্দ্র ২০০৭ : ৩৩) তবে সকল চিঠি এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ওই দুই খাতা পাবার কয়েক বছর পর রবীন্দ্রনাথ 'সাধারণের সমাদরযোগ্য নয়' বিবেচনা করে অনেকগুলো চিঠি বর্জন করেন। বেশ কয়েকটির অংশবিশেষ বর্জন ও পরিমার্জন করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনেক বছর পর ১৯৬০ সালের অক্টোবরে বর্জিত চিঠিসহ মূল খাতাদুটির সকল চিঠি নিয়ে প্রকাশিত হয় *ছিন্নপত্রাবলী* গ্রন্থ। চিঠির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫২-তে। *ছিন্নপত্রাবলী* নামটি প্রকাশনা সংস্থা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ প্রদত্ত। বর্তমান আলোচনার আকরগ্রন্থ হিসেবে *ছিন্নপত্র* বিবেচিত হবে।

দুই.

পূর্ববঙ্গে ছিল ঠাকুর এস্টেটের জমিদারি। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রবীন্দ্র-প্রপিতামহ রামলোচন ঠাকুর (১৭৫৪-১৮০৭); যা সম্প্রসারণ করেছিলেন রবীন্দ্র-পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)। দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমণির (১৭৫৯-১৮৩৩) ঔরসজাত সন্তান। নিঃসন্তান রামলোচন ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। রামলোচন কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতাগুণে পাবনার বিভিন্ন স্থানে ও

উড়িষ্যায় জমিদারি ক্রয় করেন। পরবর্তীকালে দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই ভূসম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করেন, এবং আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। (শচীন্দ্রনাথ ১৯৭৪ : ৩৮-৪০) মূলত ঠাকুর পরিবারের বৈষয়িক উন্নতি তাঁরই অর্জন। ১৮০৭ সালে পিতৃব্যের কাছ থেকে তৎকালীন যশোর (জশোহর) জেলার অন্তর্গত (বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলা) বিরাহিমপুর পরগনার জমিদারি লাভ করেন। অতঃপর নিজে ১৮৩০ সালে রাজশাহি জেলার অন্তর্গত (বর্তমানে নওগাঁ জেলা) কালিগ্রাম পরগনা এবং ১৮৩৪ সালে পাবনার (বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলা) ইউসুফশাহি পরগনার ডিহি সাজাদপুরের জমিদারি কেনেন। জমিদারি পরিচালনার বিষয়ে পুত্রদের দক্ষতার অভাব বোধ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভেবে একসময় এই জমিদারিগুলোকে ট্রাস্ট দলিলের মাধ্যমে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে তার ওপর দায়িত্ব দেন (১৮৪০)। দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার ভাব-জাগরণের অন্যতম চিন্তক। বিদ্যায়-জ্ঞানে সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মচর্চায় দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন নিবিষ্টচিত্ত। কিন্তু বৈষয়িক কাজেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। সম্পদের সুষম বণ্টন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। পূর্ববঙ্গের জমিদারিগুলোর মধ্যে সাজাদপুরের অংশ ছিল মেজ ভাই গিরীন্দ্রনাথের (১৮২০-১৮৫৪) ভাগে। কিন্তু এর দেখভালের দায়িত্ব দীর্ঘ সময় দেবেন্দ্রনাথের ওপর ছিল। এইসূত্রেই পূর্ববঙ্গে ঠাকুর পরিবারের জমিদারি মূলত তিন স্থানে বিস্তৃত ছিল। জমিদারি পরিচালনার জন্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রদের ওপর দায়িত্ব দিতে চাইলেন। তিনি দেখলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) অধ্যয়ন ও দর্শনচিন্তায় মগ্ন, সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩) সরকারি চাকরিসূত্রে দূরদেশে অবস্থান করছেন, জ্যেতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫) ছবি আঁকা ও সাংস্কৃতিক কাজে ব্যস্ত, বীরেন্দ্রনাথ (১৮৪৫-১৯১৫) ও সোমেন্দ্রনাথ (১৮৫৯-১৯২২) বিকৃতমস্তিষ্ক, অপর দুই পুত্র পুণ্যেন্দ্রনাথ (১৮৫১-১৮৫৭) ও বুধেন্দ্রনাথ (১৮৬৩-১৮৬১) অকাল প্রয়াত। ফলে বাকি থাকলেন চতুর্দশতম সন্তান ও অষ্টম পুত্র রবীন্দ্রনাথ। প্রথমে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সদর কাছারিতে বসে জমিদারির হিসাব-নিকাশ বোঝার নির্দেশ দিলেন। সেটা ১৮৮৩ সাল। এরপর জমিদারির শিক্ষানবিশকাল শেষ হলে, ছয় বছর পর, অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে জমিদারির পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে পূর্ববঙ্গে পাঠান। এই থেকে শুরু হলো রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাদেশ-অধ্যায়'। এর আগেও শৈশবে তিনি অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে (১৮৭১) এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে (১৮৭৬) শিলাইদহে এসেছিলেন, কিন্তু সেই সময় এই অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারেননি। ১৮৮৯ সালের নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে শিলাইদহে আসেন। ঠিক কোন দিন তিনি শিলাইদহে পৌছান, তা সঠিক করে বলা যায় না। রবীন্দ্রজীবনীকাররাও এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু জানাতে পারেননি। তবে শিলাইদহে পৌছে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির (*ছিন্নপত্রে* অন্তর্ভুক্ত) তারিখ দেখে অনুমান করা যায়, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি পৌছেছিলেন। (*ছিন্নপত্র*, পত্র ১০ :

পৃষ্ঠা ৩২) পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রী-সন্তানরা এখানে স্থায়ীভাবে থাকেননি, কলকাতায় অবস্থান করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ অনেকটা পরিবারবিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ববঙ্গের জীবন শুরু করেন। তাঁর দায়িত্বে ছিল তিনটি জমিদারির দেখাশোনা করা – বিরাহিমপুর, কালীগ্রাম ও সাজাদপুর। পদ্মার পারে শিলাইদহ ছিল বিরাহিমপুরের কাছারি, নাগর নদীর তীরে পতিসর ছিল কালিগ্রামের কাছারি আর যমুনার অদূরে সাজাদপুরের কাছারি। এই তিন জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল। তবে বেশি থেকেছেন শিলাইদহে।

তিন.

রবীন্দ্রনাথ *ছিন্নপত্রে* উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক। (১১২ : ২২৬) তাঁর কাছে এক অজানিত কিন্তু বহু-কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের প্রকৃতি; বিশেষত পল্লিপ্রকৃতি ও নদীময় প্রকৃতি। জীবনের নানা উপলব্ধি, আত্মানুসন্ধান ও আত্ম-আবিষ্কার, মানুষের বিচিত্রতা অনুধাবন, নিমগ্ন চৈতন্যের স্বগতোক্তি, প্রাণিপ্রেম, জীবন ও কবিতার ছন্দজ্ঞান এ-সবকিছুর উৎসবিন্দু বাংলার প্রকৃতি। বাংলাদেশের প্রকৃতিকে চোখ জুড়িয়ে, হৃদয়ের সংবেদনা দিয়ে অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ। *ছিন্নপত্রে* যে রবীন্দ্রনাথকে পাই, তিনি কবি-রবীন্দ্রনাথ। কবির দৃষ্টিতে ও কবির সংবেদনশীলতা নিয়ে তিনি বাংলাদেশকে দেখেছেন। তাঁর কাছে স্রোতহীন ছোট নদীর কোল, গাছপালা, সন্ধ্যার সূর্যালোককে স্বপ্নের মতো মনে হয়। সূর্যাস্তের মায়াময় আলো, সন্ধ্যাতারা কবির কল্পনায় জীবন্ত, মানবীয় ও চিত্রকল্পময় হয়ে ওঠে। কবি বলেন – 'সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে – একটি কোমল বিষাদ – ঠিক অশ্রুজল নয় – একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নীচে গভীর ছল্‌ছলে ভাবের মতো।' (১৪ : ৪৪) নির্জন দুপুরে জলের ছল্ ছল্ শব্দ, তার ওপর রোদের চিক্‌চিক্ দৃশ্য, ধু ধু সাদা বালির চর, বনঝাউ, পাখির চিক্‌চিক্ শব্দ তাঁর মধ্যে তৈরি করে লালিত্যপূর্ণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বপ্নাবেশ। এই প্রকৃতির মুগ্ধতা তাঁকে শৈশবের রূপকথার জগতে নিয়ে যায়। চন্দ্রালোকিত রাতে নৌযাত্রায় পুরো পরিবেশকে তাঁর মনে হয় 'পরীস্থান' (২৫ : ৬৬)। বাতাস প্রকৃতির 'স্নেহহস্তের মতো' কবির চুলে আঙুল বুলিয়ে যায়। শীত-বসন্তের সঙ্গমক্ষণে পাপিয়ার ডাক বসন্তের আগমনী বার্তা বয়ে আনে। নিস্তব্ধ চরে টিটি পাখি ডেকে যায়। পূর্ববঙ্গ আগমনের প্রথমপর্বে প্রকৃতির বিশালতা ও নির্জনতা তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তীকালে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষ। নির্জনতা ও জনতা দুইয়ের মধ্য থেকেই প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন নিসর্গের কোলে সমর্পিত মানুষের জীবনধারার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি মানুষবর্জিত বিপুল পৃথিবীর দ্বারাও অভিভূত হয়েছিলেন।' (গোলাম ১৯৮১ : ৬২) বাংলার জলসিক্ত প্রকৃতির মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন এর

স্বভাবজাত বৈরাগ্য। তবে এই বৈরাগ্য নিশ্চয়ই অলসতা নয়, বরং তা বিপুলতার মধ্যে ক্ষুদ্র নিজকে সমর্পণ করার আনন্দেরই নামান্তর। 'চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই।' (১৯ : ৫৪) বৈরাগ্যের মধ্যে আছে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় – মানুষের কর্মপ্রবাহ। কলকাতার মতো অস্থিরতা নেই বটে, আছে সহজ জীবনের আবাহন। 'নদী এবং গ্রামীণ জীবনধারায় এমনি ধরনের শিথিলতা, ধীরগামিতা ও এক ধরনের উদাসী বাউল মানসিকতা একাধিক ক্ষেত্রে লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।' (আহমদ ১৯৯৮ : ২৭) যে বাংলাদেশকে সমতল ভূমির দেশ বলে অনেকে সমালোচনা করে, বরং ওই কারণেই কবির কাছে এ দেশের মাঠের দৃশ্য, নদীতীরের দৃশ্য বেশি ভালো লাগে। (১২২ : ২৪৩)

বাংলার গ্রামে দুপুর বেলার যে এক আশ্চর্যরকম সৌন্দর্য আছে, তা রবীন্দ্রনাথের চোখেই বোধ হয় প্রথম ধরা পড়ে। দুপুর বেলা তাঁর ভেতর তৈরি করে এক ধরনের ঘোর। পতিসর থেকে লেখা পত্রে দেখা যাচ্ছে, কবি ছোট নদীর কাছে বসে আছেন। সেখানকার স্থির জল, শৈবালদামের বিস্তৃতি, নৌকার ছাদে আপদমস্তক কাপড়-মুড়ি দিয়ে দিবানিদ্রায় যাওয়া মানুষ, পানিতে পাতিহাঁসের ব্যস্ততা কবির মনে ভাবের দোলা লাগায়। পানিতে ও বালিতে রৌদ্রের অবিরাম খেলা তাঁকে আনন্দ দেয়। আবার, গ্রাম নেই – বসতি নেই, ধু ধু মাঠের দিকে চেয়ে মধ্যদুপুরে জীবনের অপার রহস্য খুঁজে ফেরেন তিনি। *চৈতালি* (১৮৯৬) কাব্যের 'মধ্যাহ্ন' কবিতায়ও এই দুপুরের ছবি এঁকেছেন এবং জীবনসত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। এই দুপুর কলকাতার দুপুর নয়; নির্জন, বিশাল আর উদাস বাংলার গ্রামের দুপুর। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্য-পিয়াসী। সেই সৌন্দর্য তিনি আকণ্ঠ পান করেছেন। শরতের সৌন্দর্য, জ্যোৎস্নালোকিত রাতের সৌন্দর্য, বর্ষার শোভা, শীতের রোদ, নদী, নালবনের মধ্যে সাদা নালফুল, পানকৌড়ি, ঘুঘুর ডাক, ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ, জলের শব্দ সবকিছুর সঙ্গে ঘটেছিল তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতা।

কোলাহলময় কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ এক নির্জনতার মধ্যে এসে পড়েছিলেন। এবং তিনি হয়তো এমন মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন। ব্যস্ত কলকাতায় থেকে তিনি জীবন সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা ছিল পরোক্ষ ও পঠন-পাঠনসূত্রে। সেই জ্ঞানের মূল্যও কোনো অংশে কম নয় বটে, কিন্তু শতভাগ প্রত্যক্ষতা দিয়ে এবং সেই প্রত্যক্ষতাকে অনুভব করবার এক মুক্ত অবকাশ পেলেন পূর্ববঙ্গে এসে। 'বালক-রবীন্দ্রনাথ কলকাতা নগরীর একটি ক্ষুদ্র কোণে বন্দী ছিলেন। কিন্তু তিনি ভুলে যেতেন, তাঁর কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিলো। তাঁর মন বারবার ছুটে যেতে চাইতো তেপান্তরের পাথার পেরিয়ে রূপকথার দেশে। কারণ জন্মকাল থেকেই তিনি ছিলেন সুদূরের পিয়াসী।' (গোলাম ১৯৮১ : ৪৪) বৃত্তাবদ্ধ নাগরিকতায় যে সুন্দরতা ধরা দেয় না, মুক্ত প্রকৃতিতে তা অবারিত, তাই কবি বলছেন – 'পৃথিবী যে বাস্তবিক কী

আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়।' (১০ : ৩২) কলকাতাকে কেন জানি রবীন্দ্রনাথ কখনোই আপন করে নিতে পারেননি। উঠতি পুঁজিতন্ত্রের যুগে কলকাতাকে তিনি দেখেন ঘোর-লাগা বর্ধিষ্ণু বিশ্রী শহর হিসেবে। অবচেতনা থেকেও তাকে এড়াতে পারেন না। তাই স্বপ্নদৃশ্যে দেখেন – 'সমস্ত কলকাতা শহরে শয়তানের প্রাদুর্ভাব – সবাই তার সাহায্যে বেড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, একটা অন্ধকার নারকী কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে সমস্ত শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে।' (২৯ : ৭৫) কলকাতা জন্ম থেকেই উপনিবেশিত শহর। উনিশ শতকের উঠতি পুঁজিতন্ত্রের প্রশ্রয়ে তখন সে আরও ফুলে-ফেঁপে উঠছে, যাকে এখন আমরা বলছি তিলোত্তমা নগরী। এই উপনিবেশিত কলকাতার নাগরিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল আশৈশব। অন্যদিকে 'তাঁর জন্ম হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনের স্বর্ণযুগে।' (মোহাম্মদ ২০১৪ : ২৬৬) ব্রিটিশ উপনিবেশের কল্যাণেই এই পিরালি ব্রাহ্মণ ঠাকুর পরিবার কলকাতার অভিজাত পরিবারে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশায়নের ফাঁদগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। তাই, বারবার মধ্যবঙ্গের গ্রাম-প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করতে গিয়ে কলকাতার প্রতি বিদ্বেষ-বিদ্রূপ থেকে রবীন্দ্রনাথের বি-ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ বাংলা বৃহত্তর ব্রিটিশ উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিকতা থেকে দীর্ঘদিন ছিল মুক্ত। অন্তত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি থেকে মুক্ত ছিলই। তাই দেখা যায়, এখানকার মানুষ দারিদ্র্যে জর্জরিত বটে, কিন্তু কর্মে ও মননে মুক্তপ্রাণ। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাণতার সাধক।

চার.

*ছিন্নপত্রে*র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নদী ও নদীপথের রাজত্ব। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসর এই তিন জায়গাতেই যাতায়াতের বাহন করেছিলেন নৌকাকে। তিন জায়গাতেই কুঠিবাড়ি বা কাছারিঘর থাকলেও বেশিরভাগ সময় অবস্থান করতেন তাঁর প্রিয় বজরা (নৌকা) 'পদ্মাবোটে'। শিলাইদহে যেখানে তাঁর কুঠিবাড়ি, তা পদ্মার ওপরেই। সাজাদপুর পরগনার সন্নিকটবর্তী নদী যমুনা, যা ব্রহ্মপুত্রের শাখা। এছাড়াও ওই অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে আত্রাই, নাগর, ইছামতি, বড়াল ও গড়াই নদী (গড়ুই); আছে পাথারপ্রতিম জলরাজ্য চলনবিল। সব নদীই রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ পেয়েছিল। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে পদ্মাই সর্বেসর্বা। পদ্মাকে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিকই বড় ভালোবেসেছিলেন। আর পদ্মাবোটকে নিজের বাড়ি বানিয়েছিলেন। *ছিন্নপত্রে* এই পদ্মা এসেছে নানাভাবে নানা রূপে। পদ্মা কখনো শান্ত-স্নিগ্ধ হয়ে ধরা দিয়েছে কবির চোখে, কখনো ধারণ করেছে তার রুদ্ররূপ। পদ্মাতেই হয়েছে কবির সূর্যোদয়-দর্শন, পদ্মাতেই সূর্যাস্ত। পদ্মার তীরে এসেই তিনি জীবনের গভীরতর সত্য কিংবা অপার সৌন্দর্যকে অনুভব করেন। তিনি দেখছেন আর লিখছেন :

> বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল্-তল্ থৈ-থৈ করছে। নদীর জল এবং তীর প্রায় সমতল, ধানের ক্ষেত সুন্দর সবুজ এবং গ্রামের গাছপালাগুলি বর্ষাবসানে সতেজ এবং নিবিড় হয়ে উঠেছে। এমন সুন্দর লাগল সে আর কী বলব।... পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না। (৩৫ : ৮৯)

চলমানতার মধ্যে প্রকৃতিকে যখন দেখেন তখনও কবি মুগ্ধ :

> আর কতবার বলব – এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধেটা কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়। (২৩ : ৬৩)

ডাঙায় অবস্থানের চেয়ে জলে ভেসে চলাতে কবি উপভোগ করেছেন বিশেষ আনন্দ; দেখেছেন দুই ধারের গ্রাম, ঘাট, শস্যক্ষেত্র, বিচিত্র ছবি, আকাশের মেঘ। সবকিছুই চলমান, গতিময়। তিনি দেখেছেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নদীর নানা বর্ণিলতা। এই মুগ্ধ বর্ণনার পাশাপাশি নদী যখন তার রুদ্রমূর্তি দেখায় তখনও কবি তাকে উপমাত্মক ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেন। কখনো উত্তাল ঢেউগুলোকে তাঁর মনে হয় তিন লক্ষ সাপের মতো ফণা তুলে তালে তালে নৃত্য করছে (২৪ : ৬৫), কখনো মনে হয় লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো (৬২ : ১৩৫), পদ্মা কখনো জাঁকালো (১১৮ : ২৩৫), কখনো প্রকাণ্ড নাগিনী (১৩৪ : ২৫৯), নদীর ওপরের ঝড়ো মেঘকে মনে হয় খ্যাপা বাইসন (৫৭ : ১২৭)। পদ্মার সঙ্গে তাঁর এই যোগ পদ্মার বিচিত্রতাকে উন্মোচন করেছে। তাই প্রমথনাথ বিশী বলছেন :

> রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবির দৃষ্টিতে পদ্মাকে আর কেউ দেখেননি। বছরের পর বছর, ঋতুর পর ঋতু পদ্মাকে নিরীক্ষণ ক'রে তিনি তার বিশ্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন। চর্মচক্ষের দৃষ্টির সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়েছে দৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টি। এই তিন দৃষ্টির সম্মুখে পদ্মা উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়েছে তার অপার রহস্য, কিছুই গোপন রাখেনি। (প্রমথনাথ ১৪১৫ : ২৯)

একই প্রসঙ্গে সমালোচক তিতাশ চৌধুরী বলছেন :

> রবীন্দ্রনাথ পদ্মাকে নারীর মতোই ভালোবেসেছিলেন। পদ্মার শান্ত-কোমল ও ভয়ঙ্কর রূপ রবীন্দ্রনাথকে ব্যাকুল করেছিল। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথ পদ্মার স্বভাব জেনেই বিমুগ্ধচিত্তে একে ভালোবেসেছিলেন। শিলাইদহের পদ্মা ছিল মূলত এবং প্রধানত রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ। (তিতাশ ২০০১ : ১৩৭)

আবার ইছামতির ওপর দিয়ে যাবার সময় ভরা বর্ষায় দুই ধারের সবুজ ঢালু ঘাট, ঘন কাশবন, পাটের খেত, আখের খেত, সারি সারি গ্রামকে তাঁর কবিতার লাইন বলে মনে হয়। ইছামতিকে তিনি বলছেন 'মানুষ-ঘেঁষা নদী', যেখানে জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্মপ্রবাহ অবলীলায় মিশে যায়। (১৪৬ : ২৭৫) অর্থাৎ নদী আর

প্রকৃতিকেই নয়, রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন প্রকৃতির সন্তান মানুষকেও। '*ছিন্নপত্র* শুধু প্রকৃতির বর্ণনা নয়, পরিবেশ ও মানবজীবন রক্ষার দিক নির্দেশনাও।' (সেলিনা ১৪১৮ : ১৫৩) মানুষ আর প্রকৃতি আলাদা থাকেনি তাঁর চেতনায়। মানুষের জীবনও নদীর মতোই সতত প্রবহমান। তাই তিনি বলেন:

> পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্রমানুষ ভাবে দেখি নে। ... মানুষও নানা শাখা প্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলছে – তার এক প্রান্ত জন্মশিখরে, আর এক প্রান্ত মরণসাগরে, দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি; কোনোকালে এর আর শেষ নেই। (৩৮ : ৯৪)

রবীন্দ্রনাথের কাছে নদী গতি ও অনিত্যতার প্রতীক। অথচ এই অনিত্যতা থেকেই তিনি দেখছেন দৈনন্দিনতাকে। দৈনন্দিনতার মধ্য থেকে রোম্যান্টিক অনুভবতা দিয়ে তিনি বাংলাদেশের গ্রাম-প্রকৃতিকে দেখার পরিসরকে বিস্তৃত করেছেন। তাঁর রোম্যান্টিকতা অনেক বেশি বাস্তবঘনিষ্ঠ। এ-পর্যায়ে রবীন্দ্রগবেষক সুধীর করণের মন্তব্যটি স্মর্তব্য:

> *ছিন্নপত্রাবলী*তে মানুষ ও প্রকৃতির একটি অখণ্ড সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রাম-প্রকৃতিকে একেবারে হাতের মুঠোয় পেয়ে তাঁর রোম্যান্টিক যৌবন যেন তাঁরই সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল। অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে তাই গ্রাম-বাঙলার ছবি এঁকেছেন তিনি। ছবির পর ছবি। গ্রামীণ মানসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ছবি আছে অন্যত্র, তাঁর *গল্পগুচ্ছে*। (সুধীর ১৯৯৪ : ১৪)

চলমানতার প্রতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ। এই গতি তাঁর পরবর্তী সাহিত্যকর্মসমূহে অন্যতম প্রভাবকের কাজ করেছিল। বিশেষত, গতিতত্ত্বের প্রসঙ্গ এলেই অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথের *বলাকা* (১৯১৬) কাব্যগ্রন্থের কথা চলে আসে। আন্তর্জাতিক দর্শন পরিস্রুত এই কাব্যগ্রন্থের উৎসমূল হিসেবে রবীন্দ্র-সাহিত্যসমালোচক প্রমথনাথ বিশী দৃঢ়ভাবে নির্দেশ করেছেন *ছিন্নপত্র*কে :

> *বলাকায়* বিবৃত গতিতত্ত্বের মূলানুসন্ধানের জন্য কোন বিদেশী দার্শনিকের বা ভারতীয় প্রাচীন দর্শনের শরণাপন্ন হওয়া অনাবশ্যক। এ ভাবটি ধীরে ধীরে কবির মনে বীজ থেকে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। *ছিন্নপত্রাবলীতে* তার বিবরণ ও পদ্মায় তার মূল নিহিত। (প্রমথনাথ ১৪১৫ : ৩১-৩২)

নাটোরের চলন বিলের ওপর দিয়েও কবিকে আসা-যাওয়া করতে হয়েছে। জলে-স্থলে একাকার নিস্তরঙ্গ এই বিলকে কবির কাছে মনে হয়েছে একঘেয়ে আর শোভাশূন্য। 'দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকে না।' (৯৪ : ১৯০) রবীন্দ্রনাথের আরাধ্য নদীর বেগ ও গতি। গতিশীল অবস্থা থেকে তিনি দেখছেন চিল উড়ছে, বক দাঁড়িয়ে আছে, নানারকম জলচর পাখি উড়ছে, শ্যাওলা ভাসছে, জলে নিমগ্নপ্রায় ধান গাছ দুলছে, স্থির পানিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা

উড়ছে। (১৯ : ৫৪) তিনি দূর থেকেই দেখছেন – গ্রামের মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসছে, জলের ধারে বসে অতি যত্নে গামছা দিয়ে শরীর মাজছে, ঘরকন্নার গল্প করছে। দেখছেন – কন্যাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো হচ্ছে, পুজোর ছুটিতে কলকাতা থেকে বাবুরা কেতাদুরস্ত হয়ে গ্রামে ফিরছে, ছেলেদের দল পরিত্যক্ত মাস্তুল গড়িয়ে মহাআনন্দে মেতে উঠছে। রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে মেয়েদের স্নানের বর্ণনা করেছেন একাধিকবার। শিলাইদহে বসে লিখছেন – 'আমার বাম পারে শিলাইদহের নারকেল এবং আম-বাগান, ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, জল তুলছে, স্নান করছে এবং উচ্চৈস্বরে বাঙাল ভাষায় হাস্যালাপ করছে; যারা অল্প বয়সী মেয়ে তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না। একবার স্নান সেরে উপরে উঠছে, আবার ঝুপ্ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাদের নিশ্চিন্ত উচ্চহাস্য শুনতে বেশ লাগে।' (৪৩ : ১০৩) রবীন্দ্রনাথ দেখেন পুরুষরা স্নানে বেশি সময় নেয় না, গোটাকতক ডুব মেরে চলে যায়। তিনি মনে করেন, মেয়েদের সঙ্গে জলের বেশি ভাব, পরস্পরের মধ্যে আছে সাদৃশ্য ও সখিত্ব।

রোমাঞ্চকর জীবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল আশৈশব। বাংলার নদীর বুকে নৌকায় চড়ে তিনি যখন ভেসে বেড়ান, তখন তাঁর শৈশবের আবদ্ধ জীবনের কল্পনার সঙ্গী 'সিন্ধবাদ-রবিন্‌সন্ ক্রুসো'দের কথা মনে পড়ে যায়। এই রোমাঞ্চকর চরিত্রগুলো তাঁর মধ্যে তৈরি করেছিল আনন্দময় জগৎ। আর বাংলার অপার ও অবারিত মুক্ততার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চলমানতার সঙ্গে সেই জগৎকে স্মরণ করতে চান। তিনি লিখছেন :

> বোধ হয় সেই ছেলেবেলায় যখন আরব্য-উপন্যাস পড়তুম, সিন্দ্‌বাদ্ নানা নতুন দেশে বাণিজ্য করতে বাহির হত, ভৃত্য-শাসিত আমি তোষাখানার মধ্যে রুদ্ধ হয়ে বসে বসে দুপুর বেলায় সিন্দ্‌বাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম, তখন যে আকাঙ্ক্ষাটা মনের মধ্যে জন্মেছিল সেটা যেন এখনও বেঁচে আছে – ঐ বালিচরে নৌকো বাঁধা দেখলে সেই যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় যদি আরব্য-উপন্যাস রবিন্‌সন্ ক্রুসো না পড়তুম, রূপকথা না শুনতুম, তা হলে নিশ্চয় বলতে পারি, ঐ নদীতীর এবং মাঠের প্রান্তের দূরদৃশ্য দেখে ঠিক এমন ভাব মনে উদয় হত না; সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার পক্ষে আর-একরকম হয়ে যেত। (৫৫ : ১২৪-১২৫)

পাঁচ.

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকে দেখেছেন নদীপথে। তাই তাঁর দেখার মধ্যে আছে 'প্যানোরোমিক' দৃষ্টিকোণ; তিনি ব্যাষ্টিকভাবে দেখেননি, দেখেছেন সামগ্রিকভাবে। 'রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে পল্লীকে দেখেছেন, অতএব পল্লীর বাইরের দৃশ্যই তাঁর চোখে পড়েছে, অন্তরের দৈন্য তাঁর কাছে ধরা পড়েনি।' (গোলাম ১৯৮১ : ৫০) ধরা পড়েছে সৌন্দর্যের প্রাচুর্য। বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলাদেশের গ্রামকে এত

নিবিড় করে, এত অন্তরঙ্গ হয়ে ও বিস্তৃত পরিসরে দেখেছেন। দেখেছেন চালচ্চিত্রিক পরিচর্যায়। পতিসরের ছোট নাগর নদীর ওপর দিয়ে তিনি চলছেন, আর এরই মধ্যে দেখা হয়ে যাচ্ছে গুটিকতক খোড়ো ঘর, কিছু চালশূন্য মাটির দেয়াল, খড়ের স্তূপ, কুলগাছ-আমগাছ-বটগাছ, বাঁশের ঝাড়, ছাগলের বিচরণ, উলঙ্গ ছেলেমেয়ে। আরও দেখছেন নদীর কাঁচা ঘাটে কীভাবে গ্রামীণ নারীরা কাপড় কাচছে, স্নান করছে, বাসন মাজছে। এও দেখছেন লজ্জাশীলা কুলবধূ মাথার ঘোমটা দু-আঙুলে ঈষৎ ফাঁক করে ধরে কলসি কাঁখে জমিদার রবীন্দ্রনাথকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে। কবির চোখ ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে সদ্যস্নাত তৈলচিক্কণ বিবস্ত্র শিশু, তীরে অর্ধনিমগ্ন প্রাচীন জেলেডিঙি, শস্যশূন্য মাঠ, দু-একজন রাখাল, গরুর তৃণ-অন্বেষণ ইত্যাদি (১৬ : ৪৮-৪৯) রবীন্দ্রনাথ যে চলতে পারছেন, এতেই তাঁর আনন্দ।

১৮৯৩-এর জুলাইয়ে অর্থাৎ ভরা বর্ষায় সাজাদপুরে যাবার পথে তিনি দেখছেন গ্রাম-গ্রামান্তর, ভাঙাচোরা ঘাট, টিনের ছাতওয়ালা বাজার, বাঁখারির বেড়া-দেয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম-কাঁঠাল-খেজুর-শিমুল-কলা-ভেরেণ্ডা-ওল-কচু, ঝোপঝাড়-জঙ্গল, ঘাটে বাঁধা মাস্তুল-তোলা বৃহদাকার নৌকার দল, নিমগ্নপ্রায় ধান, অর্ধমগ্ন পাটের খেত ইত্যাদি। (৯০ : ১৮০) সাজাদপুরে এসে সেবার তিনি কুঠিবাড়িতে উঠেছিলেন। বেশ বড় আকারের দোতলা বাড়িটি তাঁর পছন্দের ছিল। তিনি দোতলায় থাকতেন। দোতলা থেকে দেখতেন খেয়ানৌকা পারাপার করছে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্ছে, চাষারা আঁটি-বাঁধা পাট মাথায় করে হাটে আসছে, কাঠুরে কুড়োল দিয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দে গাছের গুড়িকে চেলা কাঠ করছে, ছুতোর জেলেডিঙি মেরামত করছে, গ্রামের কুকুর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কয়েকটি গরু ঘাস খেয়ে অলসভাবে কান নাড়ছে, লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে, কাক এসে গরুর পিঠে বসে বিরক্ত করছে। এ সবই বাংলাদেশের যে-কোনো গ্রামের অতি সাধারণ চিরচেনা দৃশ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে তা লাভ করেছে নিটোলতা। বর্ণনাগুণে চিরচেনা ছবি কখনো যেন অচেনা হয়ে ওঠে, আবার অচেনাকে আবিষ্কার করা যায় নতুন রূপে, নতুন সুরে। রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে এসেই সাধারণ মানুষকে কাছ থেকে দেখবার ও জানবার সুযোগ পেয়েছেন বেশি। বাংলাদেশের কৃষকদের, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চাষা'দের জীবনপ্রণালি, তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ দরদি দৃষ্টিতে অনুভব করবার চেষ্টা করেছেন। এই চাষিরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। সেই চাষি-প্রজারা রবীন্দ্রনাথকেও ভালোবাসে, ভক্তি করে। চাষিদের ভক্তির সারল্য ও সুন্দরতায় কবির কাছে তাদের হৃদয়ের বিশালত্ব প্রকাশ পায়। কবি শুনতে পান চাষিদের হাহাকার। বৃষ্টির প্রাবল্যে কাঁচা ধান কাটতে যখন তারা বাধ্য হয়, তখন কবি বলছেন – 'যখন আর কয়দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারা যায়। যদি ঐ শিষের মধ্যে দুটো চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা।' (৮৮ : ১৭৬) প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম

করেই বাংলাদেশের কৃষক আবহমান কাল থেকে তাদের জীবন নির্বাহ করে আসছে। এ অঞ্চলের কৃষক প্রকৃতিগতভাবেই কর্মমুখী ও সংগ্রামশীল। রবীন্দ্রনাথ এই কর্মপ্রবাহ ও প্রকৃতির কার্যপ্রণালির সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধান জীবন-অনুসন্ধানের সমান অর্থ বহন করে। দারিদ্র্য-আক্রান্ত বাংলাদেশের গ্রামীণ শিক্ষার অবস্থাও ছিল শোচনীয়। টুল-বেঞ্চির অভাবের কথা জানিয়ে জমিদার রবীন্দ্রনাথের কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করে একদল ছেলে। রবীন্দ্রনাথ টুল-বেঞ্চির বন্দোবস্ত করে দেন। বন্যায় আক্রান্ত মানুষদের কষ্টভোগ ও দুর্দশা দেখে তিনি ব্যথিত হন। দিঘাপাতিয়ার জলপথে যাবার সময় তিনি দেখছেন, স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা কুঁড়েঘর, জলমগ্ন প্রাঙ্গণ, ভেসে যাওয়া আবর্জনা; আর দেখছেন অনিবার্য ভবিষ্যৎকে – একটু জলবৃদ্ধিতেই ঘর প্লাবিত হবে, মাচা বেঁধে তার ওপর বাস করতে হবে, গরুগুলোকে দিনরাত পানির মধ্যেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে হবে, সাপ-পোকামাকড়-কীটপতঙ্গ মানুষের সহবাসী হবে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রোগ-শোক ছড়িয়ে পড়বে। তিনি প্রকৃতির ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেই বলছেন – 'এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়!' (১২১ : ২৪২) '*ছিন্নপত্রে* ভাষিক চিত্রশিল্পীর আঁকা দুস্থ গ্রামবাংলার এ ছবি (১৮৯১) গত একশ' বছরের বেশি সময়েও খুব যে একটা পাল্টেছে তা মনে হয় না।' (আহমদ ১৯৯৮ : ৩০)

ছিন্নপত্রের ২০ সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বেদেজীবনের একটি জীবন্ত চিত্র তুলে ধরছেন, যদিও সেই দেখা কিছুটা দূর থেকে দেখা। সাজাদপুর অবস্থানকালে জানালা দিয়ে খালের অপর পারে বেদেপল্লির জীবন ও কর্মপ্রবাহ নিরীক্ষণ করেছেন। বেদেরা যাযাবর; এই যাযাবরদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ছিল একধরনের দুর্বলতা। শিলাইদহে অবস্থানের সময়ও তিনি আওড়ান – 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন'। (৫১ : ১১৬) রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে মানুষের কর্মচাঞ্চল্য। বহুকালের জীর্ণতার মধ্যে শরীর ও মনকে তিনি জরাগ্রস্ত করে রাখতে চান না। তাই আরব বেদুইনদের মতো ঘরহীন-বাড়িহীন বেদেজীবনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেন মৃত্তিকাসংলগ্নতা, অনুভব করেন এদের সম্পর্কে গভীর ঔৎসুক্য; তিনি লিখছেন – 'এরা, নিতান্তই মাটির সন্তান, নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে – যেখানে-সেখানে জন্মাচ্ছে, পথে পথেই বেড়ে উঠছে, এবং যেখানে-সেখানে মরছে – ঠিক মনের ভাবটা ভারী জানতে ইচ্ছে করে।' (২০ : ৫৬-৫৭) তিনি এই বেদেদের মধ্যেই দেখেন জীবনের আনন্দ, জীবনকে যাপন করার নানা উপায়, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। কারণ দরিদ্র আর যাযাবর বলে এদের ওপর পুলিশি নজরদারি ও উপদ্রবও কম নয়। এক পুলিশের দারোগা কোনো অনুসন্ধানে এদের পাড়ায় এলে এক বেদে নারীর সক্রিয়তাও কবিকে সচকিত করে। কবির কাছে এই

সব দৃশ্য অভিজ্ঞতা নতুনতর হলেও এই মানুষদের অনুভব করেন অন্তরঙ্গভাবে, জানার আগ্রহ দিয়ে এবং তা প্রকাশ করেন তাঁর চিঠিতে। কারণ বাংলার মাটি আর বাংলার জলেই তৈরি এই শেকড়হীন মানুষেরা। *ছিন্নপত্রের* মৌল বৈশিষ্ট্য মানুষ ও প্রকৃতির এই সামবায়িক উপস্থাপন। রবীন্দ্রগবেষক আহমদ রফিক মন্তব্য করেছেন:

> *ছিন্নপত্রাবলী* পড়তে গেলে যে-কোনো পাঠকের মনে হতে পারে শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসর এবং পদ্মা-যমুনা-ইছামতী-আত্রাই-নাগর নদীই যেন রবীন্দ্রজীবনের একমাত্র ভুবন – অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সবদিক থেকেই। যেন এক জাদুকরী টানে রবীন্দ্রনাথ এই অচেনা ভুবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন। যে ভুবন শুধু নিসর্গের নয়, মানুষেরও। (আহমদ ১৯৯৮ : ১৬)

নতুন-পুরাতন, চেনা-অচেনা, রূপ-অরূপের তত্ত্বসন্ধান না করেও বলা যায় বাংলাদেশ রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাচুর্যের ভিত্তিভূমি, যেখানে পূর্ববর্তী চেতনার চেয়ে 'বাংলাদেশপর্ব-উত্তর' রবীন্দ্রমানসের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট স্বাক্ষরবাহী। এমন ব্যাখ্যাই বিশদভাবে দিয়েছেন গোলাম মুরশিদ তাঁর *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা* (১৯৮১) গ্রন্থে:

> এতোদিন যে মানুষ ও নিসর্গকে তিনি নিতান্ত তত্ত্বরূপে জানতেন, এ অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি তাকেই বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারলেন। এবং দেখলেন, তার বাস্তবরূপ তাত্ত্বিকরূপ থেকে বহুলাংশে ভিন্ন। পূর্ববঙ্গের নিসর্গ, মানুষ ও সমাজকে তিনি যে দরদী-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ, তা-ও আমরা লক্ষ করেছি। সামগ্রিকভাবে এই অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রমানসের কেবল মাত্রাগত পরিবর্তন ঘটায়নি, সম্ভবত গুণগত পরিবর্তনও ঘটিয়েছিলো। ধর্ম, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা, সমাজ-সচেতনতা, সাহিত্যিক আদর্শ – প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনের ছাপ চেষ্টা করলে লক্ষ্য করা যায়। (গোলাম ১৯৮১ : ৬৭)

রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জীবনের বিচিত্র প্রান্তকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। তাঁকে প্রজাদের সংকটের কথা শুনতে হয়েছে, সমাধান করতে হয়েছে, স্কুলের ছাত্রদের সভায় সভাপতিত্ব করতে হয়েছে, সাহেব-মেমদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়েছে, জমিদারির হিসাব রাখতে হয়েছে। একদিন পান্টি থেকে শিলাইদহ যাবার পথে গড়ুই (গড়াই) নদীর ব্রিজে নৌকার মাস্তুল আটকে নৌকা ডুবে প্রাণ যাবার জো হয়েছিল। তখনো তাঁকে নিজের জীবন বাঁচানোর চেয়ে মাঝি-মাল্লাদের জীবন বাঁচাতে তৎপর হতে দেখা যায়।

আলোচ্য সময়ে রবীন্দ্রনাথ, কাগজে-কলমে হলেও, একজন সামন্ত-প্রতিনিধি। পিতার ভূ-সম্পদের তদারকি তাঁর দায়িত্ব। সেই সামন্ততন্ত্র আবার উর্বর হয়েছে পুঁজির পরিপুষ্টিতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রজাদরদি মানবপ্রেমিক রূপ সামন্ততন্ত্র বা পুঁজিতন্ত্র কোনোটার সঙ্গেই খাপ খায় না। সব বিশ্বাসে দ্বিধাহীন না হয়েও অন্তত এই পর্বে তিনি সর্বতোভাবে ছিলেন মানবকল্যাণ, প্রকৃতিপ্রেম ও কর্মময়তায় সমর্পিত।

ছয়.

পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের নদী প্রকৃতি ও মানুষ রবীন্দ্রসাহিত্যের নতুন দিগন্তের পথ নির্দেশ করে। 'প্রাক্-পূর্ববঙ্গ পর্বে রবীন্দ্রমানস ছিলো অনেকটা আবদ্ধ জলাশয়ের মতো, বিশ্বের প্রাণগঙ্গার সঙ্গে তার যোগ ছিলো না।' (গোলাম ১৯৮১ : ১০১) কিন্তু বাংলাদেশের নদীময় গ্রামীণ প্রকৃতির মধ্যে তিনি যে গতিময়তা লক্ষ করেছিলেন, সেই গতির মধ্য থেকেই খুঁজে পেলেন সাহিত্যের বিচিত্র উপাদান। কেবল পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালে রচিত সাহিত্যেই নয়, পরবর্তীকালের সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের নির্যাস। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :

> পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি বড়ো উপাদান, একথা পুনরায় উচ্চারণ করা বাহুল্য মাত্র। এই প্রকৃতির ছাপ আমরা কেবল রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গ-বাসকালে রচিত সাহিত্যেই দেখতে পাই না, জীবনের শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের নিসর্গ কবির অন্তরকে শুশ্রূষা করেছে। (গোলাম ১৯৮১ : ১০৪)

চলমানতার ভেতর থেকে খণ্ড খণ্ড ছবি একেকটি অখণ্ড ব্যঞ্জনা নির্মাণ করে। বাংলাদেশের প্রকৃতি রবীন্দ্র-ছোটগল্পের সবচেয়ে বড় উপাদান। রবীন্দ্রনাথ বাংলার গ্রাম ও গ্রামের মানুষকে দেখেছেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চলতে চলতে, বজরার জানালা থেকে, কাছারির বৈঠকে বসে আর অর্ধেকটা হৃদয়ের অনুভব দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ 'পোস্ট্‌মাস্টার' গল্পের উপাদান পেয়ে যান সাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে। কুঠিবাড়ির নিচতলাতে ছিল পোস্ট্‌-অফিস। কোনো কোনো সন্ধ্যায় কবির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন সেই পোস্ট্‌মাস্টার। এইটুকু কেবল উপাদান কিন্তু এর সঙ্গে যখন কবির মানসলোক-উৎসারিত রতন যুক্ত হয় তখনই তা গল্প হয়ে ওঠে। এরপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পোস্ট্‌মাস্টার' গল্পরচনার খবর জানাচ্ছেন ইন্দিরা দেবীকে। *ছিন্নপত্রে* তিনি উল্লেখ করেছেন :

> যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট্‌-আপিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনি আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্ট্‌মাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম। এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোস্ট্‌মাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। (৫৯ : ১৩০)

আবার এই সাজাদপুরেই এক বিকেল বেলায় গ্রামের ঘাটে বোট লাগিয়ে ছেলেদের খেলা দেখতে বসেন। তাঁর দেখা একটি ঘটনার উল্লেখ করছেন *ছিন্নপত্রের* ২৮ সংখ্যক পত্রে :

> ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকোর মাস্তুল পড়ে ছিল – গোটা-কতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তা হলে খুব একটা নতুন এবং

> আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ। 'সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো! মারো ঠেলা হেঁইয়ো!' মাস্তুল যেমনি এক পাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য। (২৮ : ৭১)

আর এভাবেই রবীন্দ্রনাথ অনায়াসেই পেয়ে যান তাঁর 'ছুটি' গল্পের ফটিককে। এই ফটিক যে বাংলাদেশেরই মৃত্তিকাসন্তান, তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। নিষ্ঠুর কলকাতা ফটিককে বাঁচতে দেয়নি। এবং ধারণা করা যায়, ফটিকের কলকাতা-পর্ব রবীন্দ্রনাথের শৈশবস্মৃতি-সঞ্জাত। এ-ক্ষেত্রেও উপনিবেশিত কলকাতা-বিরোধিতা প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সাজাদপুরে অবস্থানকালে আরেক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি 'জনপদবধূ' তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় একজন কে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগুলি কচি ছেলে, অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেকগুলি পাকাচুল একত্র হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়সে বারো তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ-পনেরো দেখাচ্ছে। মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখখানি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। ... অবশেষে যখন যাত্রার সময় হল তখন দেখলুম আমার সেই চুল-ছাঁটা, গোলগাল-হাতে-বালা-পরা, উজ্জ্বল-সরল-মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকোয় তুললে। বুঝলুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে – নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ মুছতে লাগল। (৩০ : ৭৭-৭৮)

এই বর্ণনায় বারবার 'বোধ হয়' শব্দবন্ধের ব্যবহার থেকে বুঝে নেয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ শুধু দেখছেন, কিছু শুনতে পাচ্ছেন না; অনেকটা কল্পনা সহযোগে ঘটনা বুঝবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বর্ণনার কেন্দ্র যে সপ্রতিভ কিশোরী, তাঁর পরিচয় স্পষ্ট। অন্তর্লোকে আপনাআপনি নির্মিত হয়ে যায় 'সমাপ্তি' গল্পের মৃণ্ময়ীর অন্তঃকাঠামো।

কখনো কখনো ছোটগল্প যে লিখছেন এবং কেন লিখছেন, সে-সম্পর্কেও চিঠিতে জানাচ্ছেন :

> আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে,

> এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। (১০৬ : ২১৪)

অর্থাৎ 'মেঘ ও রৌদ্র' লেখার সূচনা হচ্ছে।

মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে কবির চেতনায় সাহিত্যবোধ ও শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে স্বতন্ত্র ভাবনার জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সাহিত্যতত্ত্বও এই সময়েই একটা স্বতন্ত্র আকার পায়। যেমন ইংরেজি উপন্যাসের মধ্যে তিনি খুঁজে পান না সহজতা, সুন্দরতা, কোমলতা। তাঁর কাছে সেগুলোকে কেবল মনে হয় 'প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস; কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিঙড়ে কুঁচকে-মুচকে, তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে, তার থেকে নতুন নতুন থিয়োরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা।' (৪৪ : ১০৫) কবির পরিপার্শ্ব তথা নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসার তাঁকে এই ভাবনায় ভাবিত করেছে। এই প্রকৃতির সঙ্গে মেলাতে পারেন বৈষ্ণব পদ আর মেয়েলি রূপকথা। আবার কবিতা লেখা সম্পর্কে বলছেন – 'রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তা হলে জীবনটা বেশ একরকম আনন্দে কেটে যায়।' (৪০ : ১১৪) কবিতার ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন বিশ্বজগতের সমগ্র সৌন্দর্যকে। খানিকটা কলাকৈবল্যবাদী দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলছেন – 'কোনটাতে পৃথিবীর সব চেয়ে উপকার হবে সাহিত্য-কর্তব্যজ্ঞানে সে কথা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কোনটা আমি সবচেয়ে ভালো করতে পারি সেইটেই হচ্ছে বিচার্য।' (৯২ : ১৮৪) তাঁর কাছে শিল্পের আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ। ছড়া লিখতে লিখতে বলছেন – 'ছড়ার রাজ্যে আইন-কানুন নেই, মেঘরাজ্যের মতো।' (১১৯ : ২৩৮) গ্রন্থাবদ্ধ নীরস জ্ঞান ও তত্ত্বের চেয়ে প্রকৃতির আনন্দচ্ছটা তাঁর কাছে বেশি আরাধ্য। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকারের বক্তব্য স্মরণযোগ্য :

> নদীপথে ভ্রমণের সময়ে ও কাছারিতে জমিদারি কার্যোপলক্ষে প্রকৃতি ও মানুষের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিপ্রবণ অন্তরে যে তরঙ্গ তুলেছে, এই চিঠিগুলির মধ্যে তার অব্যবহিত স্বাক্ষর লক্ষ করা যায়। আর সেইগুলিই পরবর্তীকালে অন্তর ও বাহিরের তাগিদে কবিতায়-গানে-গল্পে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। (প্রশান্তকুমার ২০০৯ : ১৮৪)

রবীন্দ্রনাথ *ছিন্নপত্রে*র কালপর্বে বা অব্যবহিত পরে অর্থাৎ বাংলাদেশে অবস্থানকালে লিখেছেন *গল্পগুচ্ছে*র অনেকগুলো গল্প, পটভূমিও এই ভূখণ্ড যার কিছু দৃষ্টান্ত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে *সোনার তরী* (১৮৯৪), *চিত্রা* (১৮৯৬), *চৈতালি* (১৮৯৬) কাব্যগ্রন্থ; *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২), *বিদায়-অভিশাপ* (১৮৯৪) নাট্যকাব্য; এছাড়া বহু গান। বিশেষত, *সোনার তরী*র কবিতাগুলো আর

ছিন্নপত্র পাশাপাশি রেখে পড়লে কবিতার প্রেরণা যে বাংলাদেশ তা সহজেই অনুমেয়। *সোনার তরী*র অবয়বশৈলীর ভেতরেও এই জনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের ছাপ আবিষ্কার করা যায়। যেমন, কবিতাগুলোর আকার দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, কবি অনেক কথা বলবার ফুরসত পাচ্ছেন। তিনি নিজের কথা, মানবজন্মের উৎসের কথা, জীবনসত্যের কথা আনন্দযোগে বলছেন এবং বলে আনন্দ পাচ্ছেন। আবার ক্রিয়াপদবহুল এই বাংলার ভাষা বিশেষ্য-ক্রিয়াবন্ধের মিশ্র ক্রিয়ার পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকেও করে তুলেছে ক্রিয়াময়। *ছিন্নপত্রে*র অনেক পত্রে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আরও কী লেখা হচ্ছে সমসাময়িক সময়ে। যেমন ৮৮-সংখ্যক পত্রে বর্ষার হঠাৎ বর্ষণে ধান কাটা নিয়ে কৃষকদের ব্যস্ততা-হাহাকার পরবর্তীকালে কবিতা হয়ে উঠছে *সোনার তরী*র 'সোনার তরী' কবিতায়। বলু অর্থাৎ বলেন্দ্রনাথের পাঠানো 'পশুপ্রীতি' নিবন্ধ পাঠ করে তিনি নিরামিষী হচ্ছেন (সাময়িক কালের জন্য যদিও), প্রাণিহত্যার বিপক্ষে কথা বলছেন, 'অ্যানিমেল জার্নাল' পড়ছেন। (১০০ : ২০০) *বিসর্জনে*র (১৮৯০) অনুরণন শুনতে পাওয়া যায় নতুন স্বরে ও সুরে। তিনি 'বৈষ্ণবকবিতা' লিখছেন সাজাদপুরে বসে, আষাঢ়ের ঘনঘোর বর্ষায়, ১৮ই আষাঢ় ১২৯৯ বঙ্গাব্দ; ৩রা জুলাই ১৮৯২-এ তিনি ৬০-সংখ্যক পত্রে স্বপ্নদৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেখানে তিনি ইমনকল্যাণ সুরে গান শুনছেন, যে গানের সুর কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। বৈষ্ণব পদাবলি সম্পর্কে তিনি অন্য আরেক পত্রে (১১৮) বলছেন, 'বৈষ্ণবপদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণবকবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।' ১৯শে আষাঢ় ১২৯৯-এ সাজাদপুরে বসে রচনা করছেন বিখ্যাত কবিতা 'দুই পাখি'। শিলাইদহের বোটেই তিনি যেন পেলেন তাঁর 'মানসসুন্দরী'কে। *চিত্রায়* 'জীবনদেবতা'রূপী কবির শুদ্ধসত্তা অন্বেষণের বার্তাও তাঁর দর্শনে-কথনে-ভাবনায় স্পষ্ট। এই সময়পর্বেই তিনি তাঁর মনোভূমিতে সেই সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করছিলেন। আরেক বর্ষায় লিখলেন 'ভরা ভাদরে', স্থান সাজাদপুর। *চিত্রা*র অনেকগুলো কবিতা লিখেছেন; যেমন 'সন্ধ্যা', 'উর্বশী', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'দিনশেষে', 'সান্ত্বনা' প্রভৃতি কবিতার রচনাস্থান পতিসর-শিলাইদহ। *ক্ষণিকা* (১৯০০) লেখার প্রস্তুতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১২৩-সংখ্যক পত্রে। ১০৮-সংখ্যক পত্রে সাজাদপুরে যাবার পথে পাবনা শহরের একটি খেয়াঘাটে বোটের জানালায় বসে আকাশে নিবিড় সন্ধ্যা দেখতে দেখতে জগৎ-জীবন-মানুষ সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে তাঁর 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতার কথা স্মরণ করেন। জীবনের ক্ষণিকতার মধ্যে যে চিরন্তন সুর তিনি অনুভব করেন, সেই চিরন্তনতার কলধ্বনিই শুনতে পান সন্ধ্যার অন্ধকারে। আরেক চিঠিতে (৯৫) যখন তিনি নারী ও পুরুষের চারিত্র্য সম্পর্কে চিরন্তন মন্তব্য করছেন – 'পুরুষরা কিছু খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ', ওই দিনই কচ ও দেবযানীর কাহিনি নিয়ে লেখেন কাব্যনাট্য *বিদায়-অভিশাপ*। (প্রভাতকুমার ১৪১৫ : ৪২) আর *বিদায় অভিশাপে*র পাণ্ডুলিপিতে আঁকা স্কেচগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে ওই

সময় থেকেই তিনি ছবি আঁকার বিষয়ে ভাবছেন; ১৮৯৫ সাল থেকে বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতি থেকে সারাৎসার সংগ্রহ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ছবি আঁকতে শুরু করেন। আরেক ভাদ্রের কোনো মন্থর দিনে রামকেলি সুরকে কবির কাছে সমস্ত আকাশের সমস্ত পৃথিবীর গান মনে হয়। আকাশের সোনালি রোদ চেখে, শৈবালের কোমলতায় মন বুলিয়ে লিখলেন গান – 'ওগো, তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে!' – (১২০ : ২৪০) এই গানটিকেই পাওয়া যায় *কল্পনা* কাব্যের পাণ্ডুলিপিতে। একই সময়ে *হিতবাদী* ও *সাধনা* পত্রিকার জন্য লিখতে হচ্ছে ফরমায়েশি লেখা। এই কালপর্বে তাঁর কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। সাহিত্যসৃজনে এই বাংলাদেশের মূল্য কবির জীবনে কত গভীর তার কথা বলেছেন জীবনের অন্তিম পর্বে (বৈশাখ ১৩৪৭, ১৯৪০) *সোনার তরী*র সূচনাকথনে :

> বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়।

ছিন্নপত্র নদীময়, *ছিন্নপত্র* মানুষময়, *ছিন্নপত্র* দৃশ্যময়। গদ্যে লেখা *ছিন্নপত্রে* ছড়িয়ে আছে কবিতার গীতময়তা। 'একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয়, হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না' (৪৯ : ১১৩) – এই ভাবনায় জারিত থাকে রবীন্দ্রনাথের মানসলোক। *ছিন্নপত্র* নিছক পত্রসাহিত্য নয়। প্রকৃত বিচারে ইন্দিরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা জানাচ্ছেন বটে, কিন্তু তাঁর অপরাপর পত্রসাহিত্যের চারিত্র্যধর্ম এখানে পাওয়া যাবে না। পত্র হিসেবে বিবেচনা না করে যদি একে আত্মদর্শনও বলা হয়, যার পুরোটা জুড়ে থাকে বাংলাদেশ, তবে তা অত্যুক্তি হবে না। *ছিন্নপত্রের* কাব্য-চারিত্র্য সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য উল্লেখ করা যায় :

> এই বই মূলত পত্র-সমষ্টি হলেও এর অধিকাংশ পত্রই রীতিমত সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত। বহু চিঠি নানা তথ্যেও সমৃদ্ধ। এই বই-এর চিঠিগুলি যে সময়ের মধ্যে লেখা, সেই ক'বছরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই চিঠিগুলি থেকে এত বেশি খবর পাওয়া যায় যে, অন্য বই থেকে তা আদৌ সম্ভব নয়। (গোপালচন্দ্র ২০০৭ : ৫)

ছিন্নপত্রে এক মহাকবির চোখে ধরা পড়েছে বাংলাদেশের রূপ ও অরূপ। বাংলার প্রকৃতি নিছক একটি ভূ-অঞ্চলের প্রকৃতি হয়ে থাকেনি। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের সান্নিধ্যে এসে বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। জমিদার হয়ে তাঁর আগমন ঘটলেও তিনি কেবল জমিদার-রবীন্দ্রনাথ

থাকেননি, থেকেছেন কবি-রবীন্দ্রনাথ হয়েই, কবি হিসেবে হয়েছেন আরও পরিণত। কবিসত্তার শুদ্ধতা *ছিন্নপত্রে* পালন করেছে প্রাণসঞ্চারী ভূমিকা। প্রকৃতিদৃষ্টি-সমাজদৃষ্টি-সাহিত্যদৃষ্টি – এই তিনের সুসামঞ্জস্যে *ছিন্নপত্র* পরিণত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ-দর্শনের উৎসবিন্দুতে। *ছিন্নপত্র* বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের কর্মপ্রবাহের এক গাদ্যিক গীতিকবিতা।

আকর গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪২২)। *ছিন্নপত্র*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

আহমদ রফিক (১৯৯৮)। *রবীন্দ্রভুবনে পতিসর*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

গোপালচন্দ্র রায় (২০০৭)। *রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

গোলাম মুরশিদ (১৯৮১)। *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

তিতাশ চৌধুরী (২০০১)। *অন্য বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪১৫)। *রবীন্দ্রজীবনকথা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

প্রমথনাথ বিশী (১৪১৫)। *শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা

প্রশান্তকুমার পাল (২০০৯)। *রবিজীবনী* (তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

মোহাম্মদ আজম (২০১৪)। *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, আদর্শ, ঢাকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী (১৯৭৪)। *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা

সুধীর করণ (১৯৯৪)। *লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

সেলিনা হোসেন (১৪১৮)। '*ছিন্নপত্রে* নদী ও মানুষ', *মাসিক উত্তরাধিকার*, (সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান), বাংলা একাডেমি, ঢাকা